সত্য খোঁজে মুক্ত-মন, সুযোগ খোঁজে সন্ধানী

অভিজিৎ রায়

'To know what is right and not to do it is the worst cowardice.' - Confucious

ধর্মের সমালোচনা কেন করা হয় এ নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে। একই বিষয়ের চর্বিত চর্বণ আর কাঁহাতক করা যায়? তবুও একই অভিযোগ ঘুরে ঘুরে আসে, একই আভিযোগের উত্তর দিতে হয় নানাভাবে, বিভিন্ন সময়ে। আজকে উত্তর নয়, একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি বরং। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দাস-বিদ্রোহের আগুন বহুবার জ্বলতে দেখা গেছে ভারতবর্ষে কখনই জ্বলতে দেখা যায় নি। কেন? উত্তরটি হচ্ছে জন্মান্তরবাদের অমৃত (হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে)। জন্মান্তরের ব্যাপারটা একটু খোলসা করা যাক। কিন্তু তার আগে বৈদিক যুগের ছবিটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বৈদিক যুগ ছিল উচ্চবর্ণের সুবর্ণ যুগ। সে সময় এমন একটা বিধি ব্যবস্থা ঈশ্বরের নামে কৌশলে কায়েম করা হয়েছিল যে, একদল ব্রাহ্মণ শুধু খানা-পিনা ভোগ বিলাস করবে, আর গায়ে গতরে খেটে মরবে শুধু শূদ্র দাসেরা। কৃষি প্রধান ব্যবস্থায় বেগার শ্রম দিতেন এই শূদ্র দাস-দাসীরা। উৎপাদনের সিংহভাগ যেত স্বাভাবিক নিয়মে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের কাছে, আর উচ্ছিষ্ট জুটত শূদ্রদের কপালে। এই নিবর্তনমূলক শোষন ব্যবস্থাটি সুচারুভাবে টিকে ছিল ঈশ্বরের নামে। লাঞ্ছিত-বঞ্চিতদের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখতে 'ঈশ্বর' সবসময়ই একটা উপযোগী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বলাই বাহুল্য। কিছু শ্লোক মনুসংহিতা থেকে দেখা যাক :

মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি তা হলে কি? এক প্রাজ্ঞ লেখক ('লেখিকা' শব্দটি আমার পছন্দনীয় নয়) প্রায়ই বলেন ধর্ম নয়, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে। ওইটাই নাকি সঠিক পথ। কিন্তু ধর্ম গ্রন্থের বিভেদ সৃষ্টিকারী নিয়ম নীতিগুলোর প্রতি অন্ধ সেজে থেকে শুধু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিয়ে পড়ে থাকলে মূল সমস্যাটি সমস্যার জায়গাতেই থেকে যাবে। শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের' ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। একজন ব্রাহ্মণ জন্মগতভাবে শূদ্রদের দলন করার ছারপত্রটুকু পায় ওই ধর্মগ্রন্থের আস্কারাতেই। এই ব্যাপারটির প্রতি লেখক কেন অন্ধ সেজে শুধু 'দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদের' থিওরী কপচাচ্ছেন তা উনিই ভাল জানেন। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হয়। শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না' ! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)।

দাসদের প্রতি অত্যাচার এবং অবিচারের ছাড়পত্র শুধু মনুসংহিতায় নয়, পাওয়া যাবে ঋকবেদ (২।২০।৭, ১০।২২।৩, ৮৬।১৯) এবং অথর্ববেদে (৫।১৩।৮)। ঐতেরিয় ব্রাহ্মণে (৫।১৩।৮)বর্ণিত একটি ঘটনায় আমরা দেখি এক মহাপ্রতাপশালী রাজা মদ্ররাজ মহানসে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এক সহস্র দাস-দাসী প্রদান করেন। রামায়নেও রাজা রামের গঙ্গার পাড়ে গিয়ে ধীবর দাসদের সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা আমরা পাই। এ নিয়ে আলোকপাত করে (ফতেমোল্লার একটি লেখার উত্তরে) প্রায় বছর দু-এক আগে '[Slavery of Hinduism]' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

বেদ ও মনুর অনুশাসনের বিরুদ্ধে শূদ্রদের অনাগ্রহ, ক্ষোভ আর সন্দেহ ক্রমশঃই দানা বাঁধছিল। তাই একটা সময় বহু সংখ্যক শূদ্র দাস সনাতন ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করতে শুরু করে। হিন্দু শাসক পুরোহিতরা এই দেখে বিপদের গন্ধ পেলেন। উচ্চবর্ণীয়দের এমনি সংকটে উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় হাজির হলেন পাঞ্চালের রাজা জৈবালী ও ব্রাহ্মণ উদ্দালক অরুনি। তাঁরা ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দিকে 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' নতুন এক মতবাদ নিয়ে এলেন - 'জন্মান্তরবাদ'। ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পেলো এক অভাবনীয় কার্যকরী মারক অস্ত্র। শুদ্রদের কানে ঢুকিয়ে দেয়া হল - তুমি শূদ্র হয়ে জন্মেছ পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণেই। এ জন্মে যদি ভাল কাজ কর, ব্রাহ্মণদের সেবা শুশ্রুষা কর, দেখবে - পরের জন্মে আর দাস হয়ে জন্মাতে হবে না। উপনিষদের এই 'জন্মান্তরবাদ' এমনভাবে সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল যে, সংখ্যাধিক্যের সুবিধে থাকা সত্ত্বেও শোষিত বঞ্চিত দাসেরা বিদ্রোহ করেনি, বরং মেনে

নিয়েছে তাদের বঞ্চনা; নিজেদের দাবী আদায়ের সংগ্রাম বাদ দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে পরজন্মের 'অমৃতের' আশায়।

সতীদাহের কথা ধরা যাক। শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে **৮১৩৫ জন নারী**। এমনকি ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হয়েছে 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল ঘটনাটি - কেউ টু শব্দটি করে নি। প্রাজ্ঞ লেখকটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে বলেছেন। কিন্তু যাঁরা একটা সময় সতীদাহের জন্য জান কোরবান করে দিত, গ্রামের যে লোকগুলো সদ্য পতিহারা বিধবা বৌটিকে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে নিজেদের বংশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখত, তারা কিন্তু কেউই সে অর্থে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কথিত আছে, ১৭২৪ সালে মারয়ারের রাজা অজিত সিংহের চিতায় উঠেছিল ৬৪ জন সতী, পানিতে ডুবে বুন্দির রাজা বুধ সিং মারা গেকে তার চিতায় উঠে ৮৪ জন; ১৬২০ সালে এক রাজপুত রাজা মারা গেলে তার চিতায় উঠেছিল নাকি ৭০০ জন সতী। এগুলো সবই ঘটেছিল হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে, সাম্প্রদায়িকতার কারণে নয়। সাধারণ মানুষ মূলতঃ আস্কারা পেয়েছিলেন ধর্মের নিবর্তনমূলক আইনগুলো থেকেই ঃ

> " Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as corrylium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned." -- [Rig Veda X.18.7] [Kane 199-200]
>
> "A sati who dies on the funeral pyre of her husband enjoys an eternal bliss in heaven" [Daksa Smrti IV.18-19] [Sm.Samu p.30] [1200, p.65]
>
> "A woman must, on the death of her husband, allow herself to be burnt alive on the same funeral pyre" [Vasishta's Padma-Purana, DuB.345].
>
> "If a woman's husband dies, let her lead a life of chastity, or else mount his pyre" [Vis.Sm. xxv.14] [Clay.13]
>
> " It is the highest duty of the woman to immolate herself after her husband ", [Br.P. 80.75] [Sheth, p.103] ইত্যাদি।

Pic: *For centuries the Hindus practised **Sati**, or widow burning, believing that a widow should be burned to death with her deceased husband.*

ধর্ম যে কি কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধ হয় Pascal বলেছেন - Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction." এ খুবই সত্যি কথা। সেতারা হাসেমকে খোলা মনে এই ব্যাপারটি ভেবে দেখবার পরামর্শ দেই। চিন্তা করুন ব্যাপারটা - জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে - আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে - চোখের সামনে কল্পণা করুন দৃশ্যটি - এই নৃশংস ব্যাপারগুলো যারা করছে তারা কিন্তু সাম্প্রদায়িক বলে করছে না, করছে নিজের বিশ্বাস থেকে ধর্ম রক্ষা করতে, সাচ্চা হিন্দু সাজতে!

খ্রীষ্ট ধর্মেও ঠিক একই ব্যবস্থা ছিল একটা সময়। ১৪ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত প্রায় **১ কোটি মহিলাকে** 'ডাইনী' হিসেবে আখ্যায়িত করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যারা এগুলো করেছেন তারা সাম্প্রদায়িক বলে করেনি, করেছে বাইবেলের বাণীতে উৎসাহিত হয়ে। দেখুন বাইবেল থেকে :

> Kill The Witches!
>
> "Thou shalt not suffer a witch to live. Whoever lieth with a beast shall surely be put to death. He that sacrificeth unto any god, save to the LORD only, he shall be utterly destroyed." (Exodus 22:18-20)

বাইবেল বর্ণিত এধরনের বানীতে উৎসাহিত হয়ে ইউরোপ এবং অবশিষ্ট বিশ্বে একটা সময় হাজার হাজার নিরাপরাধ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই আয়াতটি

হত্যায় শুধু সরাসরি প্ররোচিত করছে না, বরং হত্যা করার জন্য রীতিমত আদেশ করছে। এই ১৮ নং ভার্সটি ইউরোপে ডাইনী পোড়ানোকে 'জায়েজ' করেছে। আমেরিকাতেও একটা সময় বিচারের প্রহসন করে অসংখ্য পুরুষ এবং মহিলাকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

Pic: "Thou shalt not suffer a witch to live." (Exodus 22:18-20)

পাঠকরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, আমি এখোনো ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে একটি কথাও লিখিনি। না লিখলেও প্রাজ্ঞ লেখকটি 'ইসলাম ব্যাশার' বলে আমাকে যথারীতি গালাগালি করবেন (তাঁর সব লেখাতেই তিনি এটি করেন), এ জানা কথা। এটি বোধ হয় তাঁর অত্যন্ত প্রিয় স্টাইল। আমি তাঁকে বলেছি ইসলাম নিয়ে আমি ইদানিং বিতর্ক করিই না। ইদানিংকালে ইসলাম সংক্রান্ত যে কয়েকটি উত্তর দিয়েছি তা প্রাসঙ্গিক ছিল বলেই দিয়েছি, কাউকে অযথা 'ব্যাশ' করার জন্য লিখিনি। যেমন, কিছুদিন আগে ফয়সাল নামের ভদ্রলোকের সাথে তার লেখা 'হায় মুক্ত-মনা' নামের একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরে বিতর্ক চলাকালীন সময় হাসান নামে এক ভদ্রলোক দাবী করলেন কোরানে নাকি কোথাও স্ত্রীকে প্রহার করার কথা বলা হয়নি, আমি নাকি অর্থ বিকৃত করেছি। বাধ্য হয়ে আমাকে রেফারেনস সহ একটি প্রবন্ধ লিখতে হল। এটি আমার ইসলামের প্রতি ঘৃণার কারণে লিখিনি, লিখেছি নিরপেক্ষভাবে তথ্য পরিবেশন করার তাগিদে। এটি জনাব হাসান বলে লিখেছি তাও নয়, কোন হিন্দু যদি আমার কোন লেখার প্রতিবাদে বলেন, হিন্দু ধর্মের কোথাও মেয়েদের পোড়ানোর কথা নেই, আমি উপরের শ্লোকগুলোর অর্থ বিকৃত করেছি- তাহলেও আমি একইভাবে নিজেকে ডিফেন্ড করব। প্রাজ্ঞ এই লেখিকার এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে এত অসুবিধা হচ্ছে কেন, আমি সত্যই বুঝতে অক্ষম। ইসলামের অনেক নির্বতনমূলক আইনের কারণে প্রতিদিনই নির্যাতিত হচ্ছে অসহায় অমিনা, সাফিয়ারা। ফতোয়ার শিকার হচ্ছে ডঃ ইউনুস সায়িখ, তসলিমা, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী,

হুমায়ুন আজাদ, সালমান রুশদী প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বরা। এগুলো কি কেবলই শুধু কতিপয় 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' এর কারসাজি, নাকি সমস্যার ব্যাপকতা আরো অনেক গভীরে?

উক্ত লেখক ধার্মিকদের মনে আঘাত করেতে চান না, অথচ নিজেই একসময় মার্ক্সবাদের চর্চা করে জেনেছেন ধর্মগ্রন্থগুলো ঈশ্বরের বাণী নয়, ওগুলো মিথ্যা। তার মানে কি দাড়ালো? নিজে ধর্মের মিথ্যার বেসাতিটা ধরতে পারলেও অন্য মানুষদের অন্ধকারে রাখতে চান। এ যেন অনেকটা এরকম - আমি নিজে জানি ভুত বলে কিছু নাই, কিন্তু আবার চাইনা যে মানুষের ভুতে বিশ্বাস দূর হোক। কেউ যদি মানুষের ভুতে বিশ্বাস দূর করতে উদ্যোগী হয় - সেতারা হাসেম কি তার বিরোধিতা করে বলবেন - তুমি তো মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করছ! এটা কি ধরনের ভন্ডামো? এ তো নিজের সাথেই নিজের প্রতারণা। সেতারা হাসেম কি সত্যই চান না যে সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক, ভাবতে শিখুক যে, তাদের বাঞ্চনার কারণ ঈশ্বরের পরীক্ষা নয়, নয় কোন পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য, বরং বঞ্চনার জন্য দায়ী আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য? নিজে ধর্মের অসঙ্গতিগুলো বুঝবার পরও ধর্মের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি কাদের শ্রেনীস্বার্থ রক্ষা করছেন? এ জন্যই প্রবন্ধের শুরুতে রাখা কনফুসিয়াসের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য - To know what is right and not to do it is the worst cowardice.

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। অভিজিৎ রায়কে 'ইসলাম ব্যাশার' বানাতে গিয়ে উনি এবারকার লেখায় একটি মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন। বলেছেন, 'অভিজিৎ রায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাঙ্গালী ইন্টারনেট সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেছেন'। এই তথ্যটি মিথ্যা। আমি যখন লেখা শুরু করি তার অনেক আগেই কামরান মির্জা, ফতে মোল্লা, জামাল হাসান, জাফর উল্লাহ রা নিয়মিতভাবে এন.এফ.বি তে লিখে চলেছেন। সম্ভবত জাহেদও আমার অনেক আগে থেকেই এন.এফ.বি এবং আরো অন্যান্য জায়গায় লিখতেন। আসলে আমি যখন লিখা শুরু করেছিলাম, মুক্ত-মনা সদস্যদের মধ্যে লেখালিখিতে আমিই সম্ভবত ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। লেখক যদি বছর চারেক আগেকার এন.এফ.বির পাতাগুলো দেখেন, তাহলেই এর প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

উনি বলেছেন আমরা নাকি পয়সার লোভে নাস্তিকতা করছি। এ তথ্যটি তিনি কোথায় পেলেন জানলে বাধিত হব। আমি লিখি আমার মনের তাগিদে। ভিন্নমতের সম্পাদক কুদ্দুস খান কিংবা অন্য কোন ফোরাম মডারেটর আমার লেখার জন্য কোন রকম অর্থ সাহায্য করেন না। আবার অন্য দিকে মুক্ত-মনা চালাতে গিয়ে আমার সময় এবং অর্থ দুই ব্যয়িত হচ্ছে। মুক্ত-মনায় কোন বিজ্ঞাপনও দেয়া হয় না। আমরা কোন রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক সংগঠণ থেকেও কোন অর্থ সাহায্য নেই না। বরং মাঝে মধ্যে মনে হয় নাস্তিকতা না করে শমসের আলী জাতীয় pseudo

scientist হলে জীবনে অনেক লাভ ছিল। ধর্ম গ্রন্থের পাতায় বিজ্ঞান খুঁজে সাধারণ মানুষদের ঘোল খাওয়াতে পারলেই মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা। (মুক্ত-মনায় ডঃ শমশের আলীর উপর জাহেদের নিবন্ধটি দেখুন)। লেখক কি এই দিকটা ভেবে দেখেছেন?

লেখক আরো বলেছেন তিনি নাকি আমার সম্বন্ধে কোন রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেননি। আমি বুঝতে পারছি না এর জবাবে কি বলব। ওয়েল, তাহলে তিনি রাগের মাথায় হয়ত কিছু 'আদুরে শব্দ' (ফ্রি থিঙ্কার গোস্ট আমার মেইল খেয়ে ফেলেছে, গ্রেট ব্রাহ্মণ, মানসিক রোগী ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন [:-)]। তো ঠিক আছে । উনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। এগুলো উনি বলতেই পারেন। উনি যদি ভেবে থাকেন এগুলো লিখলে তার লেখার মান বৃদ্ধি পায়, তো লিখুন। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী বলে দাবী করলেই তো হয় না, এর যথার্থতা রাখতে হয়। আমি ছাড়াও কুদ্দুস খান, জাফর উল্লাহ, সাব্বির আহমেদ, জাহেদ, আলমগীর, বিষ্ণু দে সবাই তাকে অনুরোধ করেছেন - হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ব্বর্তী বিরোধ মিটিয়ে একসাথে কাজ করবার জন্য। তা তিনি শুনবেন না। মনে মনে ভাবছেন নিজেই ঠিক পথে আছেন। গোঁ ধরেছেন, তাঁর মতাদর্শই সঠিক। তা ভাবুন আপত্তি নেই। মত পার্থক্য থাকতেই পারে। তবে শুভাকাঙ্খি কিংবা শুভানুধ্যায়ীর উপমায় চিড়ে ভিজবে না - এভাবে প্রগতিশীল সাজা যায় না, প্রগতিশীল হতে হয়; তাঁর কথাই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলি - 'ভুল বক্তব্য দিলে বা কার্যকলাপ করলে তার প্রতিবাদ পেয়ে যাবেন', সে আপনি যেই হোন না কেন।

সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

অভিজিৎ রায়
জুন ৮, ২০০৪